ঐতিহাসিক উপন্যাস

ওমর

অখণ্ড সংস্করণ

রাফিক হারিরি

ঐতিহ্য

উ ৎ স র্গ

আমি পৃথিবীতে তিনজন বেহেস্তবাসী নিখুত মানুষকে দেখেছিলাম। এরা মানুষ থেকে বড্ড আলাদা, আমার বড় আপা মরহুমা ফাতেমা বেগম তাদের একজন, যার হৃদয়ে কোনো অন্ধকার ছিল না। তিনি দীর্ঘদিন পৃথিবীর মায়ায় বাস করতে চেয়ে ছিলেন, বাড়ির উঠোনে সজনে গাছের পাতার ফাকে সূর্যের আলোর খেলায় তার আদুরে নাতনিকে নিয়ে হেটে বেড়াতে চেয়েছিলেন অথচ চলে গেলেন সীমাহীন মৃত্যুযন্ত্রনা নিয়ে অল্প বয়সে। এমন একজন পাপহীন মানুষকে কেন স্রষ্টা এত কষ্ট দিলেন তার কোনো উত্তর আমার কাছে নেই।

আমার স্বর্গবাসী বড় আপা ফাতেমা বেগম আমার ফাতেমা আপাকে ওমর অখণ্ড উৎসর্গ করলাম।

পরম করুণাময় আমার ফাতেমা আপাকে দয়া না করলে আর কাকে করবেন।

প্রসঙ্গ *ওমর*

ওমর লেখা শুরু হয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন সারা পৃথিবী জুড়ে দুর্বৃত্তপরায়ন শাসকগোষ্ঠির খপ্পরে রাষ্ট্রক্ষমতা। রাষ্ট্রের মূল মালিক জনগণের হাত থেকে মালিকানা চলে গিয়েছিল কতগুলো ধূর্ত শয়তান কুচক্রী লোভী শাসকগোষ্ঠির দখলে। যে রাষ্ট্রের ভীত মজবুত হয় তার মালিক জনগণের অর্থে, রক্তে, শ্রমে, ঘামে সেই রাষ্ট্র শুধু প্রতীকী অর্থেই জনগণের হয়ে থাকল। রাষ্ট্রের মালিক জনগণ হয়ে গেল একমাত্র প্রজা। অন্যায় আর সীমাহীন লোভ আর ভোগের লালসায় রাষ্ট্রের সমস্ত সম্পদ জবরদখল হয়ে গেল। পৃথিবীর এমন একটা সময়েই লেখা হয়েছিল ওমর উপন্যাস। ওমর একটি প্রতীকী উপন্যাস। এই প্রতীকী উপন্যাসে কল্পনা আর বাস্তব, ঐতিহাসিক দলিল আর বানোয়াট গল্পের ঘনঘটায় কেবল একটি সত্যকেই বলার চেষ্টা করা হয়েছে। আর তা হলো রাষ্ট্রের মালিক জনগন, খলিফা হলেন শুধুমাত্র রাষ্ট্র ও জনগনের সেবক। খলিফা ওমরের সমগ্র জীবনে এই সত্যটাই বারবার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা মহাত্মা ওমর, 'খোদা তালা তার প্রতি রেজায়ে কামেল হন' ছিলেন এমন একজন রাষ্ট্রনায়ক যিনি ইতিহাসের পাতায় রাষ্ট্রপতি হিসেবে নিজের দুর্লভ আর অসামান্য আচরণের জন্য বিখ্যাত হয়েছেন। মহাত্মা ওমর তার শাসনামলে রাষ্ট্রের মালিকানা ফিরিয়ে দিয়েছিলেন রাষ্ট্রের মূল মালিক জনগণের কাছে। নিজে রাষ্ট্রক্ষমতায় স্রেফ একজন সেবক হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন। রাষ্ট্রের প্রতিটি পয়সার হিসাব তিনি পাই পাই করে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন সাধারণ জনতাকে। পৃথিবীর ইতিহাসে ওমর এমন একজন শাসক যার চরম শত্রুরাও তার প্রশংসা করেছেন দ্বিধাহীন চিত্তে। কোনো রাষ্ট্রে যখন স্বৈরশাসন কায়েম হয়, শাসক ফ্যাসিবাদী হয়ে উঠে, প্রতিষ্ঠিত হয় লুটতরাজের রাজত্ব তখন সাধারণ মানুষ ওমরের মতো একজন সেবক সুশাসকের কথা কল্পনা করে মনে প্রশান্তি পায় যেভাবে তৃষ্ণার্ত মরুচারীর চোখের একমাত্র স্বপ্ন হয় নীলনদের মিষ্টি পানির ধারা।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরকে কেন্দ্র করেই এই উপন্যাস রচিত হয়েছে, তাই বলে এটি সামগ্রিক অর্থে কোনো ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এই উপন্যাসে ইতিহাসের ডকুমেন্ট খোঁজা বা উপন্যাসকে ইতিহাসের রেফারেন্স হিসেবে নেয়াটা খুব কার্যকরী কিছু হবে না, আবার তাই বলে এই উপন্যাসের সবকিছুই গাজাখুড়ে কল্পনা বিলাস মনে করাও হবে সাংঘাতিক রকমের ভ্রান্তি। ইতিহাসকে আশ্রয় করে ইতিহাসের প্রতিষ্ঠিত সত্য ঘটনাকে বিকৃত না করে লেখকের তৈরি কাল্পনিক ঘটনাগুলো একের পর একে তৈরি হয়েছে। এই উপন্যাসে জনগণের

প্রতিনিধি দরিদ্র সেবক মহাত্মা ওমরের জীবনের খুটিনাটি খোঁজ করাও হবে একরকমের ভুল। খলিফা ওমরের সামগ্রিক জীবনকে উপজীব্য করে এই উপন্যাস লেখা হয়নি। এই উপন্যাস মানুষের প্রতিনিধি হিসেবে ওমর যখন রাষ্ট্রসেবার দায়িত্ব পেলেন তার পর থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। উপন্যাস শেষ হয়েছে হজরত ওমরের ওফাতের মাধ্যমে। এই সময়কালের ভেতর গল্পের প্রয়োজনে নানা ধরনের চরিত্ররা মহাত্মা ওমরের আশপাশের ঘটনার সাথে এসে মিলিত হয়েছে।

ওমর উপন্যাস লেখার ভেতর দিয়ে যে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার কোনো তুলনা হয় না। আপনি যতই প্রতিভাবান হোন না কেন পরিশ্রম আর চর্চার ভেতর দিয়ে যাওয়া ছাড়া কোনো বিকল্প নেই– ওমর উপন্যাসের কাজ করতে গিয়ে সেই কথা প্রতি মুহূর্তে টের পেয়েছি।

ওমর উপন্যাসের প্রথম খণ্ড যখন প্রকাশিত হলো পাঠকমহল বিপুল ভালোবাসায় ওমরকে গ্রহণ করলেন। সেই অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা হয় না। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের এই যুগে খুব সহজেই কোনো লেখার গ্রহণযোগ্যতার মাত্রা অনুমান করা যায়। তার একবছর পর প্রকাশিত হলো ওমর দ্বিতীয় খণ্ড। অবশেষে ওমর উপন্যাস অখণ্ড আকারে প্রকাশিত হলো। এই সবকিছুই সম্ভব হয়েছে পাঠকের বিপুল ভালোবাসা আর গ্রহণযোগ্যতার কারণে। আশাকরি ওমর উপন্যাস অখণ্ডও পাঠক ভালোবেসে গ্রহণ করবেন। ওমর অখণ্ডতে অতীতের ভুল ভ্রান্তিগুলো সংশোধন করার চেষ্টা করা হয়েছে। তারপরও সব ধরনের ভুলভ্রান্তির দায় লেখক হিসেবে আমি মাথা পেতে নিলাম।

অবশেষে সেই পাঠককুল যাদের ক্রমাগত উৎসাহ আমাকে এই উপন্যাসের অখণ্ড রূপ দিতে আগ্রহ জুটিয়েছে তাদের জন্য সবিশেষ প্রার্থনা। পৃথিবী নামের এই সুন্দর গ্রহের প্রতিটি দেশের উপর থেকে স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী শাসকের কালো থাবা দূর হোক, প্রতিটা দেশে পাড়ায় মহল্লায় ওমরের মতো জনপ্রতিনিধির আবির্ভাব হোক, মানুষ তার রাষ্ট্রের মালিকানা ফিরে পাক এই প্রার্থনায় মহাত্মা ওমরের এই যাত্রা সমাপ্তি হলো।

মানুষের জয় হোক, মানবতার জয় হোক, কল্যাণ হোক সকলের।

রাফিক হারিরি

রাফিক হারিরির উচ্চাভিলাষী প্রকল্প ঐতিহাসিক উপন্যাস 'ওমর'

ড. মোহাম্মদ আজম
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের জীবনভিত্তিক উপন্যাস রচনা করতে নেমে রাফিক হারিরি নিশ্চিতভাবেই একটা ঝুঁকিপূর্ণ অভিযান শুরু করেছিলেন। উপন্যাসের, এমনকি ঐতিহাসিক উপন্যাসেরও, যেসব জরুরত সম্পর্কে আমাদের ধারণা আছে, ওমরের জীবনের প্রচলিত কাহিনি ও ঐতিহাসিক ঘটনাবলিতে সেগুলোর কিছু ঘাটতি তো আছেই। বিশ্বাসের শক্ত ভিতের উপর যে কাহিনি বা ঘটনা অসংখ্য মানুষের স্থির-নির্দিষ্ট মূল্যায়ন নিয়ে জারি থাকে, তাকে সাহিত্যের আদলে এদিক-সেদিক করতে যাওয়া বিপজ্জনকই বটে। ব্যাপারটা শুধু অন্যের প্রতিক্রিয়ার নয় আসলে; বরং যিনি লিখছেন, তিনিও ওই বিশেষ ভাবাবহের ভিতর দিয়েই বড় হয়েছেন। তদুপরি যাকে ইতিহাস-রস বা ইতিহাসের সত্য নামে চেনা হয়ে থাকে, তাকে রদ করা খুব সহজ কাজও নয়, আরো বড় 'সত্যে'র প্রতিষ্ঠা ছাড়া খুব প্রশংসনীয়ও নয়।

ঐতিহাসিক সত্যের প্রায় একরৈখিকতা ছাড়াও ওমর বা তাঁর মতো কারো জীবন নিয়ে উপন্যাস লেখার আরেকটি গুরুতর সংকট ব্যক্তিটিকে আলাদা করে চেনার মতো মালমশলার অভাব। এটা ঠিক, ওমরের জীবন নিয়ে যেসব ঘটনা পড়ে বা শুনে এ মুলুকের বাচ্চারা, বিশেষত মুসলমান বাচ্চারা, বড় হয়, সেগুলো ব্যক্তি-ওমরের নামেই জাহির আছে। কিন্তু একস্তর গভীরে নজর দিতে পারলেই টের পাওয়া যাবে, এই ব্যক্তি ঠিক উপন্যাসের ব্যক্তি নয়। উপন্যাস তার আধুনিক ইতিহাসের চারশ বছর ধরে ব্যক্তিকে যে গুণে-মানে তুলে আনার জন্য এতটা সুনাম কুড়িয়েছে, ইতিহাস বা গল্পগাছার ব্যক্তি আসলে তার ধারে-কাছেও যায় না। ওমরকে নিয়ে চালু কাহিনিগুলোর আরেক দফা সমস্যা এই যে, এসব কাহিনিতে ওমর তো এক মহাবয়ানের মূর্তিমান প্রতিনিধি হওয়ার চাপে ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের অন্তত খানিকটা খুইয়ে বসেন। যদিও কাহিনিগুলোতে, ধরা যাক, ইসলামের চার খলিফাকে আলাদা সুরতে চেনা যায়, তবু দিনশেষে তাঁরা ইসলামের বার্তাবাহক হিসাবেই আমাদের সামনে উপস্থাপিত হন। ঠিক এই মাপের 'ব্যক্তি'তে উপন্যাসের পোষায় না।

সমস্যা আরো আছে। ব্যক্তিকে চেনার জন্য সমষ্টির মধ্যে স্থাপনের যে কেতা উপন্যাসের সাধারণ স্বভাব, সেই সমষ্টির প্রধান একক আবার পরিবার। নারীর সাপেক্ষে পুরুষ এবং পুরুষের সাপেক্ষে নারীকে অন্তরঙ্গভাবে চেনার একটা তরিকা আছে। মানুষ সাধারণভাবে

পারিবারিক। বিপুল অধিকাংশ মানুষের অস্তিত্ব আসলে পারিবারিকই। তাই ব্যক্তিকে চেনার সরল কিন্তু অনিবার্য তরিকা পরিবারের বলয়ে চেনা। ওমরের মতো যাঁদের অস্তিত্বের প্রধান পরিচয় পরিবার নয়, তাঁদের ক্ষেত্রেও ওই পরিবারই হতে পারে অন্যতম প্রধান কৌশল। কারণ, যা বহুজনের জন্য স্বাভাবিক বলে গণ্য হয়, তার সাপেক্ষে ব্যতিক্রম শনাক্ত ও সাব্যস্ত করা সম্ভব। বলার কথাটা হলো, ওমরের ক্ষেত্রে এ সুযোগটাও কম। একদিকে তথ্য-উপাত্তের ঘাটতি আছে, অন্যদিকে আছে পাহাড়প্রমাণ স্পর্শকাতরতা।

এ সবের সাথে যোগ করা যাক ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার নিজস্ব হ্যাপা। স্থান ও কালের ওই সংযোগবিন্দু আঁকতে পারা, যে বিন্দুতে পাত্র-পাত্রীরা জীবননাট্যে অভিনয় করলে বাস্তবের আবহটা হুবহু পাওয়া যাবে। কাজটা এমনিতেই জটিল। তার উপর স্থান ও কালের দূরত্ব যদি এমন হয় যে, বস্তুগত উপকরণগুলো, সংস্কৃতির প্রধান সূত্রগুলো আর প্রাকৃতিক ও মনুষ্যনির্মিত অবকাঠামো রীতিমতো আধা-চেনা বা প্রায় অচেনা, তাহলে কাজটা হয়ে যায় আরো দুরূহ। ওমর নিয়ে লিখতে গিয়ে রাফিক হারিরি নিশ্চয়ই এসব গভীর সংকট মোকাবেলা করেছেন।

এখানে একটা প্রশ্ন তোলা দরকার। যদি স্থান-কালের দূরত্ব এত বেশিই হবে, যদি সাংস্কৃতিক ফারাক প্রায় অচেনার আবহ তৈরি করবে, তাহলে ওই বিষয়ে সাহিত্যকর্ম বা অন্য কোনো শিল্প রচনা করতে হবে কেন? এ প্রশ্নের প্রাথমিক উত্তর অবশ্য বেশ সরল। দুনিয়া জুড়ে ইতিহাসের সব কালেই এ ধরনের শিল্পকর্ম রচিত হয়েছে। ফলে রাফিক হারিরি একই ধরনের একটা প্রকল্প নিয়ে ঠিক কাজটিই করেছেন। কিন্তু বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক রাজনীতির একটা দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হলো, ইসলামি আবহে মুসলমানি ঐতিহ্যে রচিত শিল্পকর্ম এখানে অকারণ বিরোধের মুখে পড়ে। মূর্খতাবশত এখানকার সংস্কৃতিসেবীদের একাংশ বুঝতে পারে না যে, মুসলমান সমাজের জন্য আরব-ইরান-তুরানের গল্প তাদের ঐতিহ্যের অবিচ্ছেদ্য এবং তাজা অংশ। এই বুঝতে না পারা যে ঐতিহাসিক-সাংস্কৃতিকভাবে গড়ে ওঠা ইসলামফোবিয়া, তা বুঝতে না পারাটাই মূর্খতার প্রধান প্রকাশ। ফলে কলকাতার উনিশ শতকীয় সংস্কৃতিতে উত্তর ভারতের 'প্রাচীন ভারতীয়' সংস্কৃতির প্রবল প্রতাপ, ইউরো-আমেরিকান সংস্কৃতিতে বেথেলহামস্থ যিশুর সরব উপস্থিতি, শামসুর রাহমানের কবিতায় গ্রিক কাহিনির রূপায়ণ আর ফররুখের কবিতায় মধ্যপ্রাচ্য যে আদতে একই প্রক্রিয়ার ভিন্ন ভিন্ন রূপ, তা বুঝতে অনেকেরই অনীহা দেখা যায়। বলার কথাটা হলো, এ অনীহাটা সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত। এ অনীহা মিথে আকণ্ঠ নিমজ্জিত থেকে বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চা করার পরিণতি। তা না হলে বোঝা মোটেই কঠিন নয়, ফররুখ আহমদের কবিতা মধ্যপ্রাচ্য তো দূরের কথা, পাকিস্তানের জন্যই কোনো তাৎপর্য বহন করে না; পাকিস্তান রাষ্ট্রে ফররুখের কবিতা নিয়ে উর্দুভাষী অঞ্চলে একবিন্দু আগ্রহ দেখা যায় নাই। ফররুখের কবিতা খাঁটি বাংলাদেশি মাল; কেউ নির্মম হতে চাইলে বড়জোর বলা যায়, এ কবিতা বাঙালি মুসলমানের। বলা যায়, এ কবিতা পাকিস্তান আন্দোলনের। কিছুতেই বলা যাবে না, এটা মধ্যপ্রাচ্যীয় বা আরব-ইরানের।

এ সোজা কথাটা মনে রাখলে বোঝা যাবে, ওমর বাঙালি-মুসলমান সংস্কৃতির অনিবার্য অংশ। কার্যত, রাফিক হারিরি যে কাহিনিগুলোকে মুখ্য ভূমিকায় রেখে তার উপন্যাসের প্লট

সাজিয়েছেন, তার বেশিরভাগই বাঙালি মুসলমান গল্পচ্ছলে শুনে ফেলে দূর শৈশবেই। কিন্তু উপন্যাস লিখতে গেলে এ ধরনের কাহিনিতে একটা অন্যরকম চাপ তৈরি হয়– বাস্তবসম্মত আবহ তৈরির চাপ। সে কাজটা কঠিন। বলা যায়, হারিরি আগে উল্লেখিত ঝুঁকিগুলোর সাথে সাথে এ বড় ঝুঁকিটাও নিয়েছেন। কিন্তু একদিক থেকে তার প্রত্যয়টা খাঁটি শিল্পীর। শিল্পকলা বিশেষ স্তর ছাড়িয়ে যে পর্যায়ে সার্বিকে পৌঁছায়, হারিরি সেখানে বাংলাদেশ আর তার বর্তমান বাস্তবতাকে দৃঢ়ভাবে গেঁথে দিয়েছেন। ফ্ল্যাপ বলছে, 'কোনো রাষ্ট্রে যখন স্বৈরশাসন কায়েম হয়, শাসক ফ্যাসিবাদী হয়ে ওঠে, প্রতিষ্ঠিত হয় লুটতরাজের রাজত্ব, তখন সাধারণ মানুষ ওমরের মতো একজন সুশাসকের কথা কল্পনা করে মনে প্রশান্তি পায়।' ঠিক এখানেই হারিরির এই প্রকল্প তার অন্যসব তাৎপর্যের সাথে সাথে সুগভীর রাজনৈতিক তাৎপর্যও হাসিল করে।

২.

আগেই যেমনটা ইঙ্গিত দিয়েছি, ইতিহাসের বা ধর্মীয় সত্যকে অগ্রাহ্য করে উপন্যাসের কোনো সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেয়া, অন্তত ওমরের মতো চরিত্রকে ঘিরে, খুবই দুরূহ। রাফিক হারিরি সে চেষ্টাও করেননি। অন্যভাবে বলা যায়, ধর্মীয় মূল্যবোধের আবহের মধ্যে যে মুসলমানরা জীবনযাপন করে, হারিরির উপন্যাস পড়লে তারা কোনো রকম চাপ বোধ করবে বলে মনে হয় না। লেখকের সম্বোধন, ভাষাভঙ্গি, পক্ষ-বিপক্ষ নির্ধারণ ইত্যাদির সুর পরীক্ষা করলে বোঝা যাবে, এরকম কিছু লেখকের ইচ্ছার মধ্যে ছিল না। তাহলে তিনি করেছেন কী?

প্রথমত এবং প্রধানত হারিরি ইতিহাস প্রণয়ন করেছেন। কাজটা খুব সহজ নয়। কিন্তু এ কাজের জন্য আমরা লেখককে খুব বেশি মূল্য দেবো না। কারণ, ইতিহাসে তার নিজস্বতা যথেষ্ট প্রকাশিত হয় নাই। কাজেই আমরা যাব এর পরের ধাপে। পরের ধাপ হবে ইতিহাসের বিবরণীকে উপন্যাসের ইমেজে রূপান্তর করা। এ কাজ করার জন্য দরকার হয় স্থান ও কালের সংযোগবিন্দু তৈয়ার করে ঘটনাকে মোলায়েম কায়দায় সেখানে স্থাপন করতে পারা। কাজটা হারিরি অনেক পরিমাণে করেছেন, কিন্তু সম্ভবত যথেষ্ট পরিমাণে করতে পারেননি। ইতিহাসের বিবরণীর নিজেরই একটা কাহিনির আকার থাকে। এটা যে উপন্যাসের বিবরণীর চেয়ে আলাদা জিনিস, সেই হুঁশ রাখা খুব সহজ কাজ নয়। উদাহরণ হিসাবে বলি, বাদশাহ নামদার-এ হুমায়ূন আহমেদ তাঁর রীতিমতো তুলনাহীন বিবরণী আর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও কাজটা করতে পারেননি। শাহীন আখতার ময়ূর সিংহাসন-এ প্রায় মোক্ষম কায়দায় এবং হুমায়ূন মধ্যাহ্ন প্রথম খণ্ডে অনেকাংশে কাজটা করতে পেরেছেন। রাফিক হারিরির এ চেষ্টাটা ছিল। কখনো কখনো সংলাপের বেশে আর কখনো স্থান-কালের মিলনবিন্দু তৈরি করার মধ্য দিয়ে তিনি কাজটা করতে চেয়েছেন। কিন্তু তুলনামূলক বেশিরভাগ জায়গায় ঘটনাটা যে হয়ে ওঠেনি, তার প্রধান কারণ, তিনি আসলে চরিত্র ও স্থানের ঐক্য মেনে কাহিনিটা পরিবেশন করেননি। আমরা বলব, চরিত্রকে স্থানে উপস্থিত রেখে ঘটনাগুলোকে পুনর্বিন্যস্ত করতে গেলে সামগ্রিক কাহিনিরেখায় যে বৈপ্লবিক বদল আনতে হতো, হারিরি সে উচ্চাভিলাষ দেখাননি। না দেখানোর কারণ বোধ হয় আছে উপন্যাসটির গোড়ার সত্যে, যেকথা আমরা এর মধ্যেই নানা ছলে বলেছি-হারিরির জন্য ইতিহাসের সত্য যতটা গুরুতর ছিল, উপন্যাসের সত্য ততটা নয়।

ইতিহাসের সত্যের দিক থেকে হারিরির মনোযোগ ছিল মনে হয় দুই দিকে। একদিকে ওমরের ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও মহত্ত্ব ফুটিয়ে তোলা, অন্যদিকে ইসলামি প্রগতির দিক থেকে শাসন ও বিজয় এই দুটিকে ওমরের ক্যারিশমা হিসাবে উপস্থাপন করা। এর মধ্যে ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা ও মহত্ত্ব সাধারণভাবে চরিত্র হিসাবে ওমরের উপস্থিতিতেই দেখানো হয়েছে। কিন্তু রেফারেন্স পয়েন্ট সর্বত্র ধর্মীয় ম্যাটান্যারেটিভ। এমনকি নির্ভীকতা, সর্বস্ব দানের মন, স্বজনপ্রীতিকে শক্ত হাতে দমন, বা শাসক হিসেবে সমস্ত মানুষের দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেয়ার চিন্তা-ইত্যাদি গুণগুলোও প্রচলিত কাহিনি মোতাবেকই সংঘটিত হয়েছে। এর মধ্যে অন্তত দুটি দিক বোধ হয় বেশ গুরুত্বের সাথে লেখকের মনোযোগে ছিল, যেগুলো ঠিক ঐতিহাসিক তথ্য বা গল্পে মশহুর নয়। একটি হলো তাঁর শাসনভঙ্গির গণতন্ত্র; অন্যটি মানবিক বোধের এক গভীর প্রজ্ঞাজাত উপলব্ধি। প্রথমটি প্রকাশিত হয়েছে মুখ্যত মসজিদে নববির সমাগমে। আর পরেরটির ভালো উদাহরণ হুতাইযা-উনাইযার প্রলম্বিত প্রেম-কাহিনি।

তুলনায় মদিনার বাইরের অংশে, বিশেষত রোম ও পারস্য সীমানার যুদ্ধ-ময়দানগুলোতে লেখকের দিক থেকে স্বাধীনতার সুযোগ অনেক বেশিই ছিল। এ অংশগুলোতে প্রতিপক্ষ হাজির। আর লেখক এক ধরনের ডায়ালেকটিকস তৈরির ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন বলেই মনে হয়। পুরানা সাম্রাজ্যগুলো কী কী সংকটের কারণে নিজেদের আভিজাত্যবোধ আর ঐতিহ্যগত কলাকৌশল সত্ত্বেও নতুনের কাছে পরাস্ত হচ্ছে, তার একটা রূপরেখা রক্ষা করে, আমি বলব, লেখক থিয়োলজির বাইরে সেক্যুলার ইতিহাসের সম্ভাবনা উজ্জ্বল করেছেন। আমি বলব না যে, পক্ষ-বিপক্ষের প্রতি তিনি সমান মনোযোগ দিতে পেরেছেন, বলব না যে, সেক্যুলার দৃষ্টিই তাঁর প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি-দুটোর কোনোটাই এ উপন্যাসের কাঠামোর মধ্যে করা সম্ভব ছিল না; কিন্তু এটা বলা যাবে, লড়াইয়ের ময়দানগুলোকে তিনি শয়তান ও ফেরেশতার বিরোধে নামিয়ে না এনে মনুষ্যোচিত একটা চেহারা দিতে পেরেছেন।

৩.

ওমর উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য এর ভাষাভঙ্গি ও বর্ণনার গতিশীলতা। আমি একে হয়তো প্রধান গুণই বলতে পারতাম। ঢাকার একটা সাধারণ মূর্খতার জবাব হিসাবে এটা বলা থেকে নিজেকে হেফাজত করলাম। চিন্তা ও সৃষ্টিশীলতার চর্চা তলানিতে ঠেকার প্রেক্ষাপটে ঢাকায় এ কথা এন্তার শোনা যায় যে, অমুক লেখার গদ্য ভালো এবং ঝরঝরে। এই আলাপ নিশ্চয়ই চলতে পারে। কিন্তু নিশ্চয়ই তা খুবই প্রাথমিক পর্যায়ের আলাপ হিসাবে। যে সাহিত্যকর্ম হয়ে গেছে, কিংবা যে লেখা কোনো চিন্তা প্রকাশ করতে পেরেছে, কোনো একটা কথা বলে ফেলতে পেরেছে, সে-লেখার ক্ষেত্রে ভাষার সারল্যের আলাপ তো একটা আস্ত মুনাফেকি। হয় আলাপটা হবে চিন্তা নিয়ে, অথবা বলতে হবে, কিছুই হয়নি। শুধু ভাষা নিয়ে তো কোনো আলাপ চলতে পারে না। ঢাকার ভয়ংকর অধঃপতনের লক্ষণ হিসাবেই হয়তো আলাপ আজকাল এ পর্যায়ে এসে ঠেকেছে। যাই হোক, হারিরির ওমর সম্পর্কে বরং বলা দরকার, একটা দারুণ প্যাশনে পুরা প্লটকে উদ্‌যাপন করতে পারার সাফল্য থেকেই মূলত উপন্যাসটির ভাষা এরকম গতি, এবং কোথাও কোথাও দ্যুতি, পেয়েছে। আর হারিরির লেখালেখির লম্বা ইতিহাস সম্পর্কে জানা

থাকলে এও বলা যাবে, অনুবাদ ও মৌলিক রচনায় দীর্ঘদিনের নিবিষ্টতা হয়তো একটা সমে পৌঁছেছে। আরেকটা কথাও এখানে তোলা যায়। লেখকজীবনের শুরুতে হারিরির বানান ও ভাষারীতি প্রশ্নে যে শিথিলতা ছিল তা কিভাবে যেন আজতক রয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও একটা ঢাউস রচনার গদ্য তাল ও লয় রক্ষা করে তিনি সামলাতে পেরেছেন। এ কথার অর্থই হলো, ভাষার পারিপাট্যের একটা অংশ পেশাদার সম্পাদকরাই সামলে ফেলতে পারেন। আমাদের দেশে সেই চল না থাকায় কিছু অনাবশ্যক দায় লেখকের কাঁধে চলে আসে।

সে যাই হোক, লেখার গতি সম্পর্কে উপরে যা বলা হলো সেটাও তো শিথিলমনা বা আরামপ্রিয় পাঠকের মামলা। যে পাঠক উপন্যাস-গল্প পড়তে এসে লেখার জটিলতায় দমেন না, তার জন্য এ উপন্যাসে কী আছে? উত্তরে বলব, আছে; এবং সেটাই সম্ভবত ওমর উপন্যাসে শিল্পী হারিরির সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। হারিরি তার উপন্যাসে প্রাকৃতিক ও ভৌত অবকাঠামো, মানুষের জীবন ও জীবিকা, এবং পারস্পরিক যোগাযোগ উপস্থাপনের জন্য জুতসই ভাষা তৈরি করতে পেরেছেন। আমি বলব না যে, এ ব্যাপারে শিথিলতা নাই। বেশ পরিমাণেই আছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে হারিরির এ কৃতিত্ব সম্ভবত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য থেকে যাবে। হারিরির মদিনা চোদ্দশ বছর আগের একটা আবহ তৈরি করতে পেরেছে। মরুভূমির ভাঁজে ভাঁজে খেজুরগাছ, ফসলের মাঠ আর অন্য অবকাঠামোকে তিনি এমনভাবে মূর্ত করতে পেরেছেন যে, মানুষগুলোর স্বভাব ও আচরণের একটা ন্যায্যতা তার মধ্যেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এর পরের ধাপে দরকার মানুষের পারস্পরিক সম্বোধনের ভাষা আবিষ্কার। এ কাজটাও ওমর উপন্যাসের লেখক বেশ অনেকদূর পর্যন্ত সাফল্যের সাথে করেছেন।

কাজটা আসলে খুবই কঠিন। কারণ, বাংলা মুলুকের তুলনায় ওই ভূমি আর ওই মানুষ এতই আলাদা যে, তার জন্য জুতসই ভাষা খুঁজে পাওয়া সহজ হওয়ার কথা না। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের আরেক সমস্যা হলো, যাকে মোটের উপর ইসলামি বা মুসলমানি ভাব বলা যায়, উত্তর ভারতীয় উর্দু তো বটেই এমনকি হিন্দিতেও যা দারুণ ফোটে, তা বাংলা ভাষায় ফোটানোর ক্ষেত্রে একটা ঐতিহাসিক দ্বিধা আছে। হারিরি যে এসব প্রতিবন্ধকতা বেশ স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন, তার পেছনে বোধ হয় তার আরবি সাহিত্য পঠন-পাঠনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা কাজে লেগেছে। অন্তত পারস্পরিক সম্বোধনের ভাষা যেভাবে একই স্বর ও সুর বজায় রেখে তিনি অব্যাহত রাখতে পেরেছেন, এবং তাকে একটা সামঞ্জস্যপূর্ণ মূর্তি দিতে পেরেছেন, তাতে সেরকমই মনে হয়। ওই কালের প্রেক্ষাপটে আজকাল যে ভিজ্যুয়াল ইমেজ তৈরি হচ্ছে, রাফিক হারিরি কি তাতেও খানিকটা মজেছেন? কারণ যাই হোক, ওমর উপন্যাস সম্ভবত এই সাফল্যের জন্য অনেকদিন মূল্য পেতে থাকবে।

এই পটভূমিতে লেখকের দমের প্রসঙ্গটাও উঠানো উচিত। লেখার প্রবাহের মধ্যে একটা লয় একবার প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলে তা বজায় রাখতে দম লাগে। বিশেষত এরকম দীর্ঘ রচনায়। আবার প্রয়োজনে লয় বদল করে স্বরগ্রাম ঠিক রাখতে আরেক ধরনের সক্ষমতার দরকার হয়। হারিরি প্রথমটাতে মোটামুটি সক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। উপকাহিনিগুলোর কথা মনে রাখলে হয়তো দ্বিতীয়টার কথাও বলা যাবে। তবে ওমর প্রসঙ্গে কথাটা তুললাম আসলে তৃতীয় এক

দমের কথা বলতে। বেশ কয়েকটি জায়গায় প্রয়োজন অনুসারে লেখক মনোযোগ, শৈলী আর ঘনত্ব এমনভাবে তুরীয় করে তুলতে পেরেছেন যে, বলতেই হয়, হাল ধরে মসৃণ গতিতে নৌকা চালানো শুধু নয়, প্রয়োজনে ঝঞ্ঝা সামলানোর জন্যও তিনি তৈরি ছিলেন। এক্ষেত্রে পরের জন্য খানিকটা তোলা রেখে এখন বিশেষভাবে উল্লেখ করব মরুঝড়ের কমপক্ষে দুইটা বিবরণী, এবং বেশ কয়েকটা যুদ্ধ-বিবরণীর কথা। বিশেষত খালিদের মরু-অভিযানে কল্পনা এবং কল্পনার বাস্তবায়ন বেশ উল্লেখযোগ্য চূড়ায় পৌঁছেছে। খালিদের প্রতি যতটা প্রকাশ পেয়েছে লেখকের যে তারচেয়েও বেশি পক্ষপাত ছিল, ভাষার যৌবন তার মোক্ষম প্রমাণ।

৪.

উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডের ভূমিকায় লেখক যে মর্মবিদারী হাহাকার করেছেন, তা অযৌক্তিক নয়। সত্যি সত্যি এমন একটা উপন্যাস লিখে উঠতে গেলে অবর্ণনীয় পরিশ্রম করতে হয়। আর বাংলাদেশে এরচেয়ে সত্য আর কী হতে পারে যে, লেখালেখিকে কোনো তাৎপর্যপূর্ণ অর্থে গুরুত্ব দেয়ার পরিপক্বতা এ সমাজের নাই। কিন্তু বলতেই হয়, ওমর উপন্যাস পাঠকরা মোটের উপর ভালোভাবেই গ্রহণ করেছে। যিনি আরামদায়ক কাহিনি পড়তে চান তার জন্য, যিনি ইতিহাস পড়তে চান তার জন্য, এমনকি যিনি ইসলাম পড়তে চান তার জন্যও ওমর যথেষ্ট রসদের জোগান রেখেছে। পরিশ্রমের পুরস্কার হিসাবে এটা মোটেই কম নয়।

কিন্তু উপন্যাসটিতে এমন অন্তত দুটি অংশ আছে যেগুলো দেখে মনে হয় উপন্যাসটি হয়তো তার অর্জিত সাফল্যকে ছাড়িয়ে যেতে পারত। এর একটি আছে শুরুর দিকেই-নীলের পারে গড়ে তোলা রোমান প্রাসাদের বিবরণীতে। ক্লাসিক সাহিত্যের যাবতীয় লক্ষণ আছে এ বর্ণনায়। ভাষার গাম্ভীর্য ও সৌন্দর্য থেকে শুরু করে নামশব্দের সমাহার আর অবস্থা ও অবস্থানকে পূর্ণ মূল্য দিয়ে চরিত্রায়ণ। দ্বিতীয় অংশটি আছে শুরুতেই। তবে শেষাংশে আবির্ভূত হয়েছে আবার। উপন্যাসটি শেষ হবে বলে। আমি ওমরের হত্যাকারী আর তার তরবারির কথা বলছি। তার অগ্নি-উপাসনার আকুল সৌন্দর্যের কথা বলছি। ঘৃণাকে কবিত্বপূর্ণ বর্ণনায় হত্যার যুক্তি বানিয়ে তোলার কথা বলছি। দুটি অংশেরই প্রকাশক্ষমতা আর শৈলী লেখকের মুনশিয়ানার নিখুঁত চিহ্ন। কিন্তু তার চেয়ে বড় কথা, অংশ দুটোতে পক্ষ-বিপক্ষের সচেতনতা লুপ্ত হয়ে বড় হয়ে উঠেছে লেখকের অচেতন। ইতিহাসের দিক থেকে তা পাপ হতেও পারে, কিন্তু উপন্যাসের জন্য হয়তো সবচেয়ে বড় পুণ্য।

এ ধরনের অংশগুলো ভাবতে উদ্বুদ্ধ করছে, এই লেখক ইতিহাস বর্ণনায় যে কুশলতা ইতোমধ্যেই আয় করে নিয়েছেন, তার উপর ভর করে হয়তো আরো প্রকল্প তিনি নেবেন। ওমর-এর অভিজ্ঞতা থেকে এটা বলা অবান্তর হবে না, ইতিহাসের গোলামি না করে বরং ইতিহাসকে উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করে ইমেজে রূপান্তরিত করলে, এবং নিজের প্রকল্পের পক্ষে কাজে খাটাতে পারলে, হয়তো উপন্যাসে জোরটা বাড়বে।

(লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'পরস্পর' এর জুলাই ২০২০ সংখ্যায়)

খণ্ডসূচি

ও ম র প্রথম খণ্ড ১৭
ও ম র দ্বিতীয় খণ্ড ২৫৯

ওমর

প্রথম খণ্ড

প্রসঙ্গ *ওমর* উপন্যাস

ওমর ছিলেন এমন একজন শাসক যার গুণকীর্তন তার চরম শত্রুরাও করতে কখনো সংকোচ বোধ করেনি। তার সুশাসন, ন্যায়বিচার, জনগণের প্রতি তার সার্বক্ষণিক দায়বদ্ধতা, সুনজর, সরল সহজ জীবন যাপন এবং চরিত্রের কাঠিন্যতা ও কোমলতা, তাকে কিংবদন্তি করে তুলেছে। ঐতিহাসিকগণের কৌতূহলী দৃষ্টির কেন্দ্রে ছিল ওমরের দীর্ঘ শাসনকালীন সময়ের সমস্ত কার্যকলাপ। ১৯৭৮ সনে আমেরিকান জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী মাইকেল এইচ হার্ট দ্য হানড্রেড আ রেংকিং অফ দ্য মোস্ট ইনফ্লুনশিয়াল পারসনস ইন হিসটোরি নামে একটা বই লেখেন। ইতিহাসের সবচেয়ে প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের জীবন ও কর্মের সংকলন ছিল গ্রন্থটি। এই বইয়ের একদম প্রথম তালিকায় আল্লাহর নবি মোহাম্মদের (স.) নাম উঠে আসায় তুমুল জনপ্রিয়তা পায় গ্রন্থটি। পাঁচ লাখেরও বেশি মুদ্রিত হয় এই গ্রন্থ, অনূদিত হয় বিশটির বেশি ভাষায়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে উঠে আসে ওমরের নাম। ইসলামের ইতিহাসের দ্বিতীয় খলিফা। নবি মোহাম্মদ (স.) যার বিষয়ে বলেছিলেন আমার পরে কেউ যদি নবি হতো তাহলে সে হতো ওমর। মাইকেল এইচ হার্ট তার হানড্রেড গ্রন্থটিতে ওমরের বিষয়ে খুব যৌক্তিক তথ্য তুলে ধরেছেন। তিনি বলেছেন ওমরের মেধাবী নেতৃত্ব ও দায়িত্ববোধ এবং সততা মুসলমানদের ভৌগোলিক সীমানার চেহারা পাল্টে দিয়েছিল। শুধু তাই না ওমর তার সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন 'বিজিত অঞ্চলের স্থানীয় লোকজনের কোনো ভূখণ্ড জবর দখল করা যাবে না, জোর পূর্বক তাদেরকে ইসলাম ধর্মে স্থানান্তরিত করা যাবে না।'

ওমরের শাসন ব্যবস্থা ও রাজ্য জয়ের ইতিহাসকে মনে করা হয় ইসলাম ধর্মের প্রবল বিস্তারের ইতিহাস। আরবের মরুপ্রান্তর থেকে ওমরের শাসনকালীন সময়ে ইসলাম প্রবেশ করে ইয়োরোপের সবুজ প্রান্তরে। দামেশক থেকে শুরু করে কনসটান্টিনোপল, আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর, পারস্য সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে ইসলামের মিলিশিয়ারা।

ঐতিহাসিকগণ ইতিহাসের বিখ্যাত বীর আলেকজান্দারের সাথে ওমরের খুব আকর্ষণীয় তুলনামূলক আলোচনা করেছেন। ঐতিহাসিকগণের মতে আলেকজান্দার বিশ বছর বয়সে রাজ্য শাসনের ভার গ্রহণ করার পর তার সেনাবাহিনীর সবচেয়ে তুখোর প্রশিক্ষকদের কাছ থেকে তীর আর তরবারি চালানো শিখেছিলেন। যুদ্ধের সমস্ত কলাকৌশল করায়ত্ত করেছেন। শুধু তাই নয় তার শিক্ষক ছিলেন স্বয়ং এরিস্টোটল। বিশ বছর বয়সে ক্ষমতা গ্রহণ করে পরবর্তী দশ বছরে আলেকজান্দার ১৮ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা বিজয় করেছিলেন। এই বিজয়ের ইতিহাসে তার নির্দেশে নিজ সেনাবাহিনীর অসংখ্য সেনাপ্রধানকে গুপ্তঘাতকের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছিল। সম্রাটের বিরুদ্ধে ক্ষোভের কারণে সেনাবাহিনীর বড় একটা অংশকে ধ্বংসের মুখে পড়তে হয়েছিল।

অপরদিকে খলিফা ওমরের দশ বছরের খেলাফতের সময় মুসলমানরা বিজয় করে বাইশ লক্ষ বর্গমাইল এলাকা। খলিফার শাসনকালীন এই সময়ে তাকে কোনো বিদ্রোহের মুখোমুখি হতে হয়নি। বরং তার সততা দূরদর্শিতা ও নেতৃত্বের কারণে পারস্য থেকে শুরু করে আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত মুসলিম বাহিনী এক নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলত। শুধু তাই নয়, ইয়ারমুকের যুদ্ধে মহাবীর খালিদকে তিনি এক কথায় সেনাপ্রধানের পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছিলেন। খালিদ বিনা বাক্যে নেতার

নির্দেশ মেনে নিয়েছেন। মুহূর্তেই নিজেকে কোনো বাক্য ব্যয় না করে সাধারণ সৈনিকদের কাতারে নামিয়ে এনেছেন। এবং নতুন সেনাপ্রধানকে বলেছিলেন একজন সাধারণ সৈনিক হিসেবে আপনি এখন আমাকে আরো বেশি সক্রিয় দেখতে পাবেন।

ওমরের পূর্বপুরুষ কোনো রাজ্য শাসক ছিলেন না। ওমর নিজেই তার খেলাফতের সময় অসংখ্যবার বলেছিলেন, 'আমার বাবা উটের রাখাল ছিল, আমিও বাবার উটের রাখাল ছিলাম। মরুভূমিতে উট আর ভেড়া পালন করে নিজের জীবিকা অর্জন করেছি।' আলেকজান্দারের মতো ওমরের রক্তে রাজ্য শাসনের ইতিহাস ছিল না। কিন্তু তার নেতৃত্ব এতই শক্তিশালী ছিল যে দায়িত্বে অসততার কারণে তিনি একটি মাত্র নির্দেশে মিশরের গভর্নরকে পদচ্যুত করে তাকে মেষ পালন করতে মরুভূমিতে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। ওমরের এই সব কার্যকলাপ তাকে ইতিহাসের পাতায় কিংবদন্তি করে তুলেছে।

ওমর নামের এই উপন্যাসটি মূলত ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমরের রাজ্য শাসন, তার রহস্যময় জীবন আখ্যান নিয়ে। ওমর একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। এই উপন্যাসটি লিখতে গিয়ে ইতিহাসের অনেক কিছুর উপর নির্ভর করতে হয়েছে। কাল্পনিক উপন্যাস লেখার ক্ষেত্রে ইতিহাসের তথ্যের বিকৃতি না ঘটিয়ে ইতিহাস নির্ভর একটি উপন্যাস রচনার চেষ্টা হলো ওমর।

এই উপন্যাসের মাধ্যমে কোনো ঐতিহাসিক গ্রন্থ লেখার চেষ্টা করা হয়নি। কেবল একটি গল্প বলার চেষ্টা করা হয়েছে, যার কেন্দ্রে আছেন ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা ওমর।

ওমর উপন্যাসের প্রথম খণ্ডটিতে ওমরের খেলাফত কালীন সময়ের নানা ঘটনা নিয়ে আসা হয়েছে। তার রাজ্য বিস্তৃতি ও বৈদেশিক রাজ্য জয়ের নানা ঘটনা চলে আসবে ওমর উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ডে।

প্রায় দুই বছরের পরিশ্রমের ফসল এই উপন্যাস। গ্রন্থটি রচনার ক্ষেত্রে কিছু মানুষের নাম স্মরণ না করলে নিজের কাছে নিজেই ছোট হয়ে থাকব।

প্রথমেই প্রকাশনা সংস্থা ঐতিহ্যের আরিফুর রহমান নাইমের নাম স্মরণ করতে হয়। অত্যন্ত মেধাবী, সদালাপী ও কিছুটা অন্তর্মুখী এই মানুষটাই সর্বপ্রথম এমন একটা বিষয় নিয়ে কাজ করার কথা বলেন। তারপর শুরু হয় পরিকল্পনা। একটা ছোট বীজ থেকে কীভাবে বিশাল একটা গাছ মাটির উপর দাঁড়িয়ে যায় এই উপন্যাস নিয়ে কাজ না করলে সেটা বোঝা যেত না। তার প্রতি কৃতজ্ঞতা। এ ছাড়া এই উপন্যাস রচনায় যাদের পরামর্শ আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছে তাদের মধ্যে অন্যতম হলো আমার শিক্ষক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি সাহিত্যের অধ্যাপক ডক্টর এহসান যুবায়ের, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক নানা সময় আমাকে গ্রন্থ ও তথ্য উপাত্ত দিয়ে সহায়তা করেছেন। তাদের কাছে অনেক কৃতজ্ঞতা।

ওমর উপন্যাসটি আশা করি পাঠকমহল ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে গ্রহণ করবেন।

প্রস্তাবনা

হৃদয়ে প্রতিশোধের আগুন চেতনাকে গ্রাস করে
যেভাবে প্রজ্বলিত আগুন ছাই বানিয়ে দেয় শুকনো খর্জুর শাখা
(প্রাচীন আরবি লোককথা)

লম্বা ঝুলওয়ালা জোব্বার ভেতর থেকে ধারালো ছোরাটা বের করে দেখে সে। গলির ভেতর মিহি অন্ধকার। পায়ের নিচে ঠান্ডা বালি। মাথার উপরে চাঁদের হালকা আলোয় চারপাশের অন্ধকার বড্ড রোগাটে আর ফ্যাকাশে। রাতের আঁধারে আধখানা চাঁদের মৃদু আলোতে ইস্পাতের ধারালো খঞ্জর চকমকি পাথরের মতো ঝিলিক দিয়ে ওঠে। দুই মাথা ওয়ালা খঞ্জর যেন হাসছে আর চিৎকার করে বলছে রক্ত চাই আমার রক্ত চাই। লাল উষ্ণ শোনিত ধারায় আমাকে সিক্ত করে দাও। রক্তের স্পর্শে আমার অশান্ত শরীরকে শান্ত করো।

ধারালো খঞ্জরের দিকে তাকিয়ে সে একবার হেসে উঠে। খুব মৃদু হাসি। অন্ধকারে তার হাসি কেউ দেখতে পায় না। এই ধরনের খঞ্জর রোম সাম্রাজ্য থেকে নিয়ে আসা বিশেষ ধরনের দামেশকিয়ান ইস্পাত দিয়ে তৈরি। এই সব খঞ্জর সচরাচর কারো হাতে থাকে না। ক্ষমতাধর ব্যক্তিরা দুর্লভ এই খঞ্জরের মালিক হয়ে থাকে। সে বিশেষ কেউ নয়। অত্যন্ত সাধারণ একজন মানুষ, একজন গোলাম মাত্র। কিন্তু ভাগ্যের কী খেলা পারস্য সাম্রাজ্যের মহান বীর আর গুপ্ত ঘাতকদের বিশেষ সম্মানবাহী ভয়ঙ্কর এক অস্ত্র তার হাতে চলে এসেছে।

মদিনার অলিতে গলিতে নেমে এসেছে রাতের অন্ধকার। দিনের তীব্র দাবদাহ কেটে রাতের সুশীতল বাতাস ছড়িয়ে পড়ছে সব জায়গায়। আকাশে আধখানা চাঁদের মিহি আলোতে মদিনার ঘরবাড়িগুলো কেমন ভৌতিক লাগে। রাস্তায় খুব একটা মানুষ নেই। এশার আজান হয়ে গেছে। নামাজের জন্য চলে গেছে সবাই মসজিদে। দু-একজন এদিক সেদিক হেঁটে বেড়াচ্ছে। রাস্তার পাশে ঘরগুলোর সামনে কারো কারো উট সারাদিনের ক্লান্তি কাটিয়ে বসে বসে জাবর কেটে বিশ্রাম নিচ্ছে। মাঝে মাঝে মুখ দিয়ে ঘোৎ ঘোৎ শব্দ করছে। রাতের দক্ষিণা শান্ত ঠান্ডা বাতাস বাড়ির কাছের খেজুর গাছের পাতার উপর ছর ছর শব্দ করে উড়ে গেল আবার কোনো অচিন মরুভূমির দিকে। সেই বাতাসে কোনো কোনো বাড়ির ভেতর থেকে গরম যবের রুটি ভাজার মিষ্টি গন্ধ তার নাকে এসে লাগে। মিষ্টি যবের রুটি ভাজার গন্ধের সাথে উটের দুধ আর খেজুরের মিশ্রণে বিশেষ এক পায়েসের নাক সিঁড়সিড়ে গন্ধ ভেসে বেড়াতে থাকে মদিনার ছোট ছোট অলিতে গলিতে। রাতের খাবার তৈরি করছে মদিনাবাসী।

মদিনাবাসীর এই সুখ, এই শান্তি, এই সুমিষ্ট বাতাস, আজানের মন শান্ত করা ধ্বনি কোনো কিছুই তার মনকে শান্ত করতে পারে না। এত সুন্দর মোহনীয় একটা পরিবেশে তার মন দুঃখে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠে। মনের ভেতর অদৃশ্য ক্রোধ আর প্রতিশোধের আগুন জ্বলজ্বল করতে থাকে। রাগে ক্ষোভে তার দুচোখ রক্তাভ হয়ে উঠে। মদিনার এই অলি গলি, মরুপথ, মসজিদ, আজানের শব্দ, কোরানের ধ্বনি এই সব কোনো কিছুই তার না। এইগুলো কখনোই তার হবে না। বুকের ভেতর কী এক আগুন যেন বার বার দাউ দাউ করে বের হয়ে আসতে চায়। সেই আগুনে ইচ্ছে করে আরব থেকে শুরু করে দামেশক রোম, বাইজেন্টাইন সব ধ্বংস করে দিতে। পায়ের নিচের এই বালি, মদিনার খেজুর গাছ, মরুউট কোনো কিছুই তার সাথে কথা বলে না। এগুলো তার নয়। ধারালো খঞ্জর হাতে নিয়ে তার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠে।

'হে অগ্নিপ্রভু তবে কেন তুমি আমাকে এখানে নিয়ে এসেছ। কী অপরাধ ছিল আমার? কী অপরাধ ছিল আমার সন্তানের, পরিবার পরিজনের, আমার প্রিয় মাতৃভূমির। প্রভু আমি তো কখনো তোমার অবাধ্য ছিলাম না। তাহলে কেন এই মিছে ভয়ঙ্কর পরীক্ষায় আমাকে ফেললে? নাকি এটাই তোমার ইচ্ছে মহান প্রভু। তাই যদি হয় তোমার ইচ্ছে তবে তাই হোক। আজ রাত আমার জন্য বিশেষ এক রাত। হে অদৃশ্যের মহান প্রজ্বলিত প্রভু তোমার ইচ্ছেই তবে সত্যি হোক।'

বাবুস সালামের সরু তিন রাস্তার মাথায় দাঁড়ালে এখান থেকে মসজিদে নববি একদম পরিষ্কার দেখা যায়। সে তীর্থের কাকের মতো মসজিদে নববির দিকে তাকিয়ে থাকে। লোকজন এক এক করে নামাজ পড়তে মসজিদে যাচ্ছে। মসজিদের ভেতর ছোট ছোট মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখা আছে। তার মৃদু আলোতে মানুষ নামাজ পড়ছে। তাদের নামাজের সেজদার ছায়া পড়ছে মসজিদের পাথুরে দেয়ালে। কেউ মৃদু সুরে কোরান পড়ছে। সে বাবুস সালামের তিন রাস্তার মাথায় দাঁড়িয়ে কোরানের সেই সুর শুনতে পায়।

'ওয়া মা কানা লি নাফছিন আন তামুতা....'আল্লাহর অনুমতি ব্যতীত কারো মৃত্যু হতে পারে না, যেহেতু এর মেয়াদ অবধারিত। কেউ পার্থিব পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই, এবং কেউ পারলৌকিক পুরস্কার চাইলে আমি তাকে তার কিছু দেই, এবং শীঘ্রই কৃতজ্ঞদিগকে পুরস্কৃত করব।' (সূরা আল ইমরান: আয়াত ১৪৫; ৩:১৪৫)

কোরানের শব্দগুলো তার মনের মধ্যে কোনো ভাব বা ভয়ভীতি কিংবা চিন্তা তৈরি করে না। সে মনে মনে শুধু একবার বলে আল্লাহর অনুমতিতেই আমি সব কিছু করব।

হাতের খঞ্জরটার দিকে আরেকবার ভালো করে তাকায় সে। এই রকম খঞ্জর দামেশক ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না। কাদিসিয়ার যুদ্ধে নিহত হওয়া পারস্যের রাজকীয় সেনাপতির বর্ম থেকে সে এই খঞ্জরটা চুরি করেছিল। খঞ্জর হাতে নিলেই বোঝা যায় এটা ভয়ঙ্কর রক্তপিপাসু। রক্তের স্পর্শে এর মধ্যে প্রাণ ফুটে ওঠে। খঞ্জরের হাতলে শক্ত মসৃণ কাঠের উপর গলিত স্বর্ণ দিয়ে খোদাই করা যুদ্ধের দৃশ্য। তার খাজগুলো সম্ভ্রান্ত উটের শক্ত সরু চামড়া দিয়ে মসৃণ করে বাঁধানো। মাথার অংশটা নতুন চাঁদের মতো বাঁকিয়ে ক্রমশ সুইয়ের মতো সূক্ষ্ম সুচালো আর ধারালো হয়ে উঠেছে। খঞ্জরের মাথার নিচেই একটু বিচ্ছিন্ন হয়ে